ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সময়ের পরিবর্তনে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পগুলির ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ও উত্তরণের ক্রমপরিণতি চিত্র দেখতে পেলাম। সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোটগল্পে নারীভাবনার বিবর্তনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই যে সমস্ত শিল্পী ছোটগল্প রচনা করেছেন, তাদের গল্পে নারীর জীবন পরিচয়কে প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। কারণ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প উনিশ শতকের সার্থক যুগোচিত শিল্প। উনিশ শতকের নবজাগরণের উদ্দীপনায় নারীকে প্রথম মানবিকতার পর্যায়ে আনা হল। তার আগে আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ, শোচনীয়, অমানবিক। কাজেই ছোটগল্পে নারীর বাস্তব যে পরিচয় ফুটে উঠে তার নিরিখে আমরা নারীভাবনার বিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কন করতে পারি। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ তথা সংসারে নারীর গতানুগতিক হীন অবস্থান প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে চিত্রিত হয়েছে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছোটগল্পে নারীর জীবন পরিচয় প্রকাশিত হলেও তা ছিল নিতান্ত বিক্ষিপ্ত, বিবৃতিধর্মী ও নারীর ব্যক্তিত্বহীন সাধারণ ঘর-সংসারী বৈশিষ্ট্যে আলোকিত। অন্দরমহলের পরিধি ও সামাজিক নিয়মনীতির শৃঙ্খলে তাই প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্পের নারীর জীবন চিত্রিত হয়েছে। সেখানে নারীর নিজস্ব ভাবনা তথা ব্যক্তিত্বময়ী অবস্থান প্রায় অনুপস্থিত। তবে কোথাও কোথাও লেখকের সহানুভূতি ও প্রতিবাদী ভাবনা সে সব গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষতঃ স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে একজন লেখিকা হওয়ায় নারীর মনের যন্ত্রণা, বঞ্চনা, আবেগ, অপমান ও অবমাননার দিকটি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন

। কোন কোন গল্পে লেখিকা নারীকে পুরুষের আচরণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করেও চিত্রিত করেছেন। তবে এ সমস্ত গল্প যথার্থ অর্থে ছোটগল্প হয়ে ওঠে নি।

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা ছোটগল্পকে সার্থক রূপদান করলেন। তাঁর অসংখ্য গল্পে ধারাবাহিকভাবে নারীর বৈচিত্র্যময় বিবর্তিত জীবন প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কালের লেখা ছোটগল্পে সমাজের প্রচলিত চেহারা থেকে একটু একটু করে পরিবর্তিত পরিচয় নিয়ে নারী দেখা দিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নারীর বাস্তব চেতনার রূপায়ন রবীন্দ্রসাহিত্যে বরাবরই ছিল। কাব্যে তা' খুব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বার কথা নয়, কারন কবিতা কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ ও কল্পনাজাত বিষয়। কিন্তু মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিতে সংসারে নারীর অসম অবস্থান ও অবরুদ্ধ বেদনার চিত্র কবিতাতেও কালানুক্রমিকভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষতঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার ও মনুষ্যত্বের বিকাশ যেন কাব্যে সুস্পষ্ট ও সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রথম জীবনের কাব্য 'মানসী' (১২৯৭)-র 'নারীর উক্তি', 'গুপ্ত প্রেম' ও 'বধূ' ইত্যাদি কবিতায় সমাজ শাসনে অবরুদ্ধ নারীর নীরব যন্ত্রণাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এসব কবিতায় নারী বুদ্ধি ও শক্তিতে যেন অপরিণতমনা ও আবেগে আকুল।

সময়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শেষ জীবনে লেখা কাব্যে নারীও পরিবর্তিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী, আধুনিকা হয়ে উঠেছে। 'চিত্রা' (১৩০০-১৩০২) কাব্যের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় একইসঙ্গে নারীর প্রেয়সী রূপ ও দেবী রূপের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আবার 'বলাকা' পর্ব থেকে নারীর ব্যক্তিত্ব সবুজপত্র পর্ব পরবর্তীকালে লেখা কাব্য 'পলাতকা' (১৩২৪-২৫)-এর 'মুক্তি', 'নিষ্কৃতি' ইত্যাদি কবিতায় নারীর প্রতি আমাদের সমাজে সামাজিক ও পারিবারিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। নারীর এই আত্মসচেতন রূপ 'পুনশ্চ' (১৩৩৯) কাব্যের 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাগুলিতে আরও তীব্র হয়েউঠেছে। 'ক্যামেলিয়া' কবিতাতে কবি দেখালেন -- ''ও মেয়ে

নিজের দায় নিজেই নিতে পারে'' । কিংবা 'সাধারণ মেয়ে'-ও নারী বলে বিশ্বজয়ী হয়ে উঠতে পারে । শেষ বয়সে লেখা 'শ্যামলী' (১৩৪৩)-র 'বাঁশীওয়ালা' কবিতার 'বাংলাদেশের মেয়ে'-ও বাঁশীর সুরে 'কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে' ধিক্কার জানাতে পারে । এভাবে ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস , নাটকেও নারীর আত্মসম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 'বিদায় অভিশাপ' (১৩০০)-এ ধর্ম , সমাজ , নীতির উর্দ্ধে নারীর মানবিক আবেদন মুখ্য হয়ে উঠেছে । 'বাঁশরী' (১৩৪০) নাটকে বাঁশরী উচ্চশিক্ষিত গুণী , আধুনিক নারী । 'চতুরঙ্গ'(১৯১৪)-র দামিনীর নারীসত্তা সামাজিক সংস্কার ও বিদ্রোহের এক রূপ । এভাবে ছোটগল্পের পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বত্রই নারীভাবনার বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ে নারী তার চিরাচরিত সনাতনী রূপ নিয়ে মূলতঃ আলোচিত হয়েছে । উনিশ শতক পর্যন্ত আমাদের সমাজে নারীর পরিচয় সামাজিক , পারিবারিক রীতিনীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল । প্রথম পর্যায়ের একাধিক গল্পে সামাজিক কিছু কুসংস্কার , যেমন — পণপ্রথা , বাল্যবিবাহ , বহুবিবাহ , কৌলিন্যের কালিমা , অশিক্ষার অন্ধকার , সতীদাহ প্রথার মতো ভয়াবহ কুপ্রথার দ্বারা নারীকে মূল্যহীন করে রাখা হয়েছিল । সামাজিক এই সমস্ত কুসংস্কারের কাছে আত্মবিসর্জন করে , কখনো পরোক্ষ প্রতিবাদ করে , অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীত্বের অকারণ অপমান ও অসম্মানিত জীবনের দুঃখকে মেনে নিয়েই ধীরে ধীরে নারী যেন পরিবর্তিত মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকার অর্জন করতে চেয়েছে । ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল মনোভাব নারীকে বেশ কিছু গল্পে দিয়েছে মানুষের মতো করে বাঁচার অধিকার । উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সদস্যা হয়ে নারী তার সম্মানিত জীবনাচরণ করেছে বেশ কিছু গল্পে । এই প্রথম পর্যায়ে নারীর ব্যক্তিমূল্য নয় বস্তুমূল্য তথা বাহ্যিক সৌন্দর্যই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে । গুণে নয় , রূপজ মোহে পুরুষের মন ভুলিয়ে নারীকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে হয়েছে । গার্হস্থ্য জীবনসুখ রচনা-ই এ পর্যায়ে ছোটগল্পে নারীর জীবনাচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল । তবে

কোন কোন গল্পে মেয়েরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। আবার কোন কোন গল্পে মেয়েরা সংসারে স্বামীর প্রেমের প্রতারণা ও অন্যায় আচরণের যোগ্য জবাবও দিতে শিখেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে সময়ের বিবর্তনে নারীও কিছুটা যেন এগিয়ে এসেছে। এ পর্যায়ের গল্পে একদিকে যেমন নারীর সংগ্রামীস্বভাব পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ও স্বীকৃত হয়েছে। সামাজিক অন্যায়, অপমান ও নারীত্বের পরাভবকে মেয়েরা সমস্ত ছোটগল্পে মেনে নিচ্ছে না। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশ, দেশের পরাধীনতার মর্মযন্ত্রণা মেয়েরাও অনুভব করতে পারছে। সর্বোপরি বিবাহ নামক নারী নির্যাতনের নিষ্ঠুর সামাজিক নিয়ম থেকে কোন কোন নারী সরে এসেছে। স্বামীর সংসারে নিছক সেবাদাসী হয়ে থাকার অপমানকে মেয়েরা নিজেরাই কাটিয়ে উঠছে। অর্থাৎ অধুনিক নারীর মতো মেয়েরা এখানে আত্মসচেতন, ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী, শিক্ষা ও যুক্তিতে, সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। প্রথম পর্যায়ের নারীর নীরব প্রতিবাদ সরব ভাষায় এ পর্যায়ের গল্পে সোচ্চারিত হয়ে উঠেছে। রূপে নয়, মেধা ও মননে, চিন্তনে, বুদ্ধিবৃত্তির অনুভবে ও কল্পনায় জয় ঘোষণা করছে মেয়েরা নিজেরাই এ পর্যায়ে। পুরুষ তাদের মূল্য না দিলেও আত্মসম্মান লাভে ও মনুষ্যত্বের মহান আনন্দ লাভ থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করছে না। পুরুষের বানানো একপেশে সমাজে পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে চলতে এ পর্যায়ে নারীরা আর অভ্যস্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পে মেয়েরা নারীভাবনার ক্ষেত্রে জোড়ালো, সার্থক পরিণত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। প্রথম দিক্‌কার গল্পে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ তখন পর্যন্ত নারীকে মনে করা হোত 'নারী মনোহীনা, তাই শরীরই বসতি' — শেষ পর্যায়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, নারীর মন, বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তশক্তির

অসাধারণ কথা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও নারীর কল্যাণী মূর্তিরই প্রকাশ সামগ্রিকভাবে গল্পগুলোতে ধরা পড়েছে। তবে শুধু স্বপ্নে বা কল্পনায় নয়, আদর্শ রূপায়ণে নারী ব্রতী। মানবিক গুণে, বুদ্ধির বিকাশে, ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণে এ পর্যায়ের মেয়েরা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। যদিও উত্তর সবুজপত্র পর্যায়ের শেষ ছোটগল্পে নারীর প্রগতির যথার্থ পরিচয় প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু এই পর্যায়ের বেশীরভাগ ছোটগল্পের মূল সুর মূলতঃ নারীর ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র বিকাশ। ব্যক্তিগত স্বার্থসুখ বিসর্জন দিয়ে, বিবাহ বিরোধী ভাবনার পোষণে, সামাজিক সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠার অদম্য প্রবল মানসিক শক্তিতে নারী এ সমস্ত গল্পে অনেক সক্রিয়, সার্থক ও অসাধারণ, দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থে ও মহৎ আদর্শে নারী এখানে সামাজিক নিয়মকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারে। শেষ পর্যায়ের অধিকাংশ গল্পের নারীর কাছে পত্নীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি কোন সামাজিক সংস্কার-ই বড়ো নয়, নারীর নারীত্ব তথা নিজস্ব উপলব্ধি ও সত্য দর্শন-ই এখানে তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্পে পুরুষ নারীকে অন্দরমহলের হীন অবস্থানে রেখে চলতে বাধ্য করেছিল। সেখানে পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতার কথাই প্রকাশিত ছিল। কিন্তু যুগপরিবর্তনে এই চিত্র পাল্টে গেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প থেকেই নারী সংসারের সংকীর্ণ গন্ডীটুকু আঁকড়ে ধরে থাকে নি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের বিভেদ-বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে তীব্র আত্মসচেতন নারী আত্মপরিসরের অন্বেষণে বেরিয়ে গেছে। এভাবে নারী তার নিজস্ব পরিচয়ে, সমস্ত বাধা, প্রতিকূলতা কাটিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে, সমাজকে বাঁচাতে পারে এই শেষ পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় থেকে সমাজের অত্যাচারে হার মানলেও শেষে সেই পরাজয়ের গ্লানি ও অপমান নারীকে করে তুলেছে অপরাজেয়, বলিষ্ঠ, অসাধারণ, আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত।